সাহাবীদের আলোকিত জীবন

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল (আরবী): ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা
অনুবাদ: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম
অনুবাদ-সম্পাদনা: মাওলানা মুজাম্মিল হক

সবুজপত্র

অনুবাদকের কথা

সাহাবীদের জীবনীর ওপর লিখিত মিসরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা'র صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ আরবী বইটি আরব দেশসমূহের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব দেশ এ বইটি তাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে। বইখানা ইতোমধ্যেই আরবী ভাষা-ভাষীদের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের অনেক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে বইখানা পেশ করার জন্য ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আহমদ তুতুনজীর উদ্যোগে অনুবাদে হাত দেই। ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

নানাবিধ প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা ও অনিশ্চয়তা আমার অনুবাদ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিকূলতার এ ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করেই এর অনুবাদ অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে ২০০০ সালের রমযান মাসে অবশিষ্ট ছয় খণ্ডের অনুবাদই সমাপ্ত হয়। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ, পর্যালোচনা ও অন্যান্য খণ্ডের সম্পাদনা, কম্পোজসহ আনুষঙ্গিক কাজগুলোর পর্যায় অতিক্রম করার পূর্বেই আমি অসুস্থ হয়ে লেখাপড়া করার অযোগ্য হয়ে পড়ি। যে কারণে দেড় বছরকাল এর পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে থাকে।

আল্লাহর রহমতে একটু আরোগ্য লাভ করলে পুনরায় এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমার এ কাজে সহযোগিতা করার লক্ষে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই প্রখ্যাত কলামিস্ট সালেহ উদ্দীন আহমদ জহুরী নিঃস্বার্থভাবে আমার পাণ্ডুলিপিগুলো দেখে দেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মিল হক তাঁর গবেষণা ও অন্যান্য সম্পাদনার কাজ ফেলে রেখে দ্রুত বইখানার তরজমা মিলিয়ে দেখেন এবং তা সম্পাদনা করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেন।

রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রফেসর, সুসাহিত্যিক ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশার এই বইখানা আরব বিশ্বের কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামী জীবন গঠনে সহায়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। একইভাবে ওলামা-মাশায়েখ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকাদের নিকটও বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত। কলুষিত ও ব্যাধিগ্রস্ত ঘুণে ধরা সেই জাহেলী সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ জাতিকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে তুলে কীভাবে কলুষমুক্ত পরশ পাথরে পরিণত করা হয়েছিলো তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে 'সাহাবীদের আলোকিত জীবন'-এ। বইটি একেকজন সাহাবীর জীবনের একেক ধরনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত।

লেখক অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের আরবী ভাষায় আটান্ন জন সাহাবীর জীবনী সম্বলিত এ বইটি সাত খণ্ডে সমাপ্ত করেন। আরবী ভাষার গভীরতা, মাধুর্য, প্রাঞ্জলতা ও ভাবের সমন্বয়কে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার জন্য বইটির হুবহু অনুবাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও শাব্দিক অর্থের সীমারেখা পেরিয়ে ভাবার্থের আশ্রয়ও নিতে হয়েছে। কিছু সংখ্যক সাহাবীর ইসলামপূর্ব বিদ্রোহী জীবনীর সাথে পরবর্তী ইসলামী জীবনের তুলনামূলক চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁদেরকে লেখক যেভাবে সম্বোধন করেছেন, অনুবাদেও সেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তাঁদেরকে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নজরে যদি অনুবাদ সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা আমাদেরকে অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আন্তরিক চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, যে কথাটি উল্লেখ না করলেই নয় তা হলো, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা মাত্রই প্রতিটি নর-নারীর দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই সোনালী সমাজের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এ বইয়ে উল্লিখিত আটান্নজন সাহাবীই রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বর্ণযুগের সদস্য। যাঁদেরকে তিনি শারীরিক ও মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক, ঈমানী এবং জিহাদী চিন্তা-চেতনায় বলীয়ান করে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠাকরত সর্বযুগের মানুষের জন্য অনুকরণযোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন।

সারা পৃথিবীতেই আজ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছে। এ পথের সংগ্রামী প্রতিটি তরুণ-তরুণী, এমনকি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও সাহাবীদের জীবনী ও চিন্তা-চেতনার অনুকরণ একান্ত আবশ্যক। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্য আদর্শ কর্মী বাহিনী তৈরির কাজে যদি আমার এ পরিশ্রম সামান্যতম কাজেও আসে তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করবো।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয়নবীর সাহাবীদের মতো জীবন যাপন করার তাওফীক দিন এবং তাদের সাথেই আমাদের হাশর নসীব করুন। আমীন!

মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম
৫ রবিউস সান, ১৪২৪ হিজরী
৬ জুন, ২০০৩ ঈসায়ী

সূচিপত্র

উসামা ইবনে যায়েদ (রা)	১৭
সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)	২৭
উমাইর ইবনে সা'দ (রা) (বাল্য জীবন)	৩৫
উমাইর ইবনে সা'দ (রা) (কর্মজীবন)	৪৩
জা'ফর ইবনে আবী তালিব (রা)	৫৩
আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেস (রা)	৬৯
সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)	৮১
হুযাইফা ইবনে আল ইয়ামান (রা)	৯১
উক্‌বা ইবনে আমের আল জুহানী (রা)	১০৩
হাবীব ইবনে যায়েদ (রা)	১১১
আবূ তালহা আল আনসারী (রা)	১১৯
রামলাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা)	১২৭
ওয়াহ্‌শী ইবনে হারব (রা)	১৩৭
হাকীম ইবনে হিযাম (রা)	১৪৫
আব্বাদ ইবনে বিশর (রা)	১৫৩
যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)	১৫৯
রাবীআ ইবনে কা'ব (রা)	১৬৯
ফাইরোয আদ্‌দাইলামী (রা)	২৬৭
সাবেত ইবনে কায়েস আল আনসারী (রা)	২৭৫
আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) (দুই খণ্ড কমরবন্দ বিশিষ্ট জান্নাতী মেয়ে)	২৮৩
তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত তাইমী (রা)	২৯৩
আবূ হোরাইরা আদ দাওসী (রা)	৩০৩
সালামা ইবনে কায়েস আল আশজাঈ (রা)	৩১৭
মুআয ইবনে জাবাল (রা)	৩২৭

বিষয়ভিত্তিক সূচিপত্র

(বর্ণক্রমিক বিন্যাস)

অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার এক বিরল ও নজিরবিহীন নমুনা /২৪৮

অর্ধ পৃথিবীর শাসক ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরে সর্বোৎকৃষ্ট খাবারের বর্ণনা /৩২২

অধীনস্ত দায়িত্বশীলদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে চমৎকার দৃষ্টান্ত /৪৫

অন্যায়ভাবে জমির সীমানা ভাঙার ভয়াবহ পরিণতি /৩১

অধস্তন সংগঠনের বাইতুল মালের হিসাব-নিকাশের জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ /৪৫

অভাবী হওয়া সত্ত্বেও নিজের উপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া /৫১

অপরাধ সত্ত্বেও গৃহকর্মীকে শাস্তি না দেওয়ার দৃষ্টান্ত /৩১৩

অমুসলিম সমাজে ইসলামের দাওয়াত পরিচালনা পদ্ধতি /৭১

অমুসলিমদেরকে দেওয়া ওয়াদা পালনের দৃষ্টান্ত /৯৩

আদর্শ মাতার তেজোদ্দীপ্ত জিহাদী চেতনা /২৯১

আহলে বাইতের সদস্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন /১৬৬

আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নমুনা /১৬৬

আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত /১২৪

আন্‌নাসু আ'লা মুলূকি দীনিহিম' বা জনসাধারণ শাসকদের চরিত্রগুণে গুণান্বিত /২৬৫

আল কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত ও অর্থ বুঝে অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান /১৭০

আপত্তিকর কথাবার্তা ও কার্যকলাপের উত্তম পন্থায় জবাব দেয়ার পদ্ধতি /১৭৮

আদর্শ জীবনসঙ্গিনীর উত্তম উদাহরণ /৩৩৩

আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোআ /২৪৮

উসামা ইবনে যায়েদ (রা)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার পিতার চেয়ে 'উসামার পিতা অধিক প্রিয় ছিলেন। আর উসামাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয়।"

–আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর প্রতি উমর ফারূক (রা)-এর উক্তি

হিজরতের সাত বছর পূর্বের কথা। মক্কায় মুসলমানদের জন্য ছিলো চরম দুর্দিন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ প্রতিদিনই কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হতেন। ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ এবং ইসলাম প্রচারের কারণে মুসলমানদের ওপর অব্যাহতভাবে অত্যাচার চলত। এহেন যুলুম-অত্যাচার আর দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মাঝেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে দেখা গেলো আনন্দের আভাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে আনন্দের পবিত্র আভাস দেখে সকলেই আনন্দিত হলেন। সংবাদ এল, উম্মুল আইমানের ঘরে আল্লাহ একটি ছেলে দান করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়ই খুশি হলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে হাসি ফুটল। কে এই শিশু, যার জন্মগ্রহণের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত আনন্দিত হয়েছিলেন? হ্যাঁ, এ শিশুই উসামা ইবনে যায়েদ।

এ শিশুর জন্মগ্রহণের সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় আনন্দিত হলেন। এ শিশুর পিতামাতার সন্তান লাভে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশি হওয়ারই কথা। কারণ, তাঁরা অতি আপনজন। তাদের একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'প্রিয়পাত্র' যায়েদ ইবনে হারেসা এবং অপরজন উম্মুল আইমান। এই শিশুর মায়ের নাম ছিলো 'বারাকাতুল হাবাশীয়াশী' যাকে উম্মুল আইমান নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মা আমেনা বিনতে ওয়াহাব-এর ক্রীতদাসী। আমেনার জীবদ্দশায় তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালন করেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়ের ইনতিকালের পরও একটি সময় পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেবাযত্ন করেন। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়াতে বিচার-বিশ্লেষণের ও পার্থক্য শক্তির দু'চোখ খুলেই নিজের মা ছাড়া আর যাকে আপন বলে দেখেন, তিনি এই মহিলা। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

'আমার মায়ের পর তিনিই আমার মা এবং আমার পরিবারের অবশিষ্ট মুরব্বী, যাকে নিজ বাড়িতেই রেখেছি।'

তিনিই সেই সৌভাগ্যবান শিশুর মা উম্মুল আইমান আর তার পিতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইসলামপূর্ব যুগে যিনি ছিলেন তাঁর পালক-পুত্র, সম্মানিত সাহাবা, গোপনীয় বিষয়ের বিশ্বস্ত আমানতদার, নবী-পরিবারের সদস্য এবং সবার চেয়ে অধিক ভালোবাসার পাত্র।

উসামা ইবনে যায়েদ-এর জন্মগ্রহণে মুসলমানগণ খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। এ কারণে যে, যেসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুশি প্রকাশ করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে সাহাবীগণও খুশির বহিঃপ্রকাশ করেছেন। এ ছেলেকেই সাহাবীদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'প্রিয়পাত্রের প্রিয় সন্তান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ছোট শিশু উসামাকে সাহাবীগণ এ উপাধিতে ভূষিত করে মোটেই বাড়াবাড়ি করেননি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে খুবই ভালোবাসতেন। এ দুই বন্ধুর মধ্যে বয়সের পার্থক্য তো আসমান-জমিন ফারাক। উসামা ইবনে যায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমাতুয্যাহ্‌রার ছেলে হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সমবয়সী। হাসান দেখতে খুবই সুন্দর, গোলাপী ফর্সা এবং হুবহু তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো। আর উসামা ছিলেন খুবই কালো, খর্বাকার নাসিকা, তার হাবশী মা উম্মুল আইমানের মতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার কোনো পার্থক্য করতেন না।

উসামাকে তাঁর এক উরুর ওপর বসাতেন এবং অন্য উরুর ওপর হাসানকে। অতঃপর উভয়কেই বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُمَا فَاَحِبَّهُمَا

'হে আল্লাহ, আমি এ দু'জনকেই সমান ভালোবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালোবাস।'

উসামার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা কতটুকু গভীর ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। একদিন উসামা হোঁচট খেয়ে দরজার চৌকাঠের ওপর পড়ে যাওয়ায় তার কপাল কেটে যায় এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে উসামার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছে ফেলার ইঙ্গিত করেন; কিন্তু তাতে তাঁর বিলম্ব হতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই উঠে গিয়ে উসামার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুষে থুথু করে ফেলতে থাকেন এবং তাকে আদর-সোহাগভরা কথাবার্তা শোনান ও সান্ত্বনা দেন, যাতে সে সন্তুষ্ট হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাকে শৈশবে যেমন ভালোবাসতেন, যৌবনেও ঠিক তেমনি ভালোবাসতেন। কুরাইশদের এক অভিজাত নেতা হাকিম ইবনে হাযাম ইয়ামেনের এক বাদশাহ যুইয়াযদানের নিলামকৃত মহামূল্যবান গাউন পঞ্চাশ দিনার বা স্বর্ণ মুদ্রায় খরিদ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহার দেন। কিন্তু ইবনে হাযাম তখনো মুশরিক থাকায় তিনি তার উপহার গ্রহণ না করে তা কিনে নেন এবং একবার মাত্র জুমআর দিনে পরিধান করে তা উসামাকে উপহার দেন। উক্ত গাউন পরে উসামা তার সমবয়সী আনসার ও মুহাজির যুবকদের মধ্যে সকাল-বিকাল ঘোরাফিরা করতেন।

উসামা যৌবনে পদার্পণ করলে তার মধ্যে চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলির অপূর্ব প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য তার প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট হন। উসামা শুধু সাধারণ অর্থেই বুদ্ধিমান ছিলেন না; বরং অসাধারণ প্রজ্ঞারও অধিকারী ছিলেন। তিনি শুধু সাহসী

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)

হে আল্লাহ, তুমি যদিও আমাকে এই উত্তম দীন থেকে বঞ্চিত করেছ,
কিন্তু আমার ছেলে সাঈদকে এই দীন থেকে বঞ্চিত করো না।

–সাঈদ (রা)-এর পিতা যায়েদের দু'আ

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল জন-কোলাহল থেকে বেশ দূরে অবস্থান নিয়ে কুরাইশদের কোনো এক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি দেখছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, পুরুষেরা দামি দামি রেশমি পাগড়ি মাথায় বেঁধে ইয়ামেনের তৈরি গাউন পরিধান করে অনুষ্ঠানে ঘোরাফিরা করছে। মহিলারা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রং-বেরঙের জামা, কাপড়-চোপড় ও বিচিত্র অলংকারাদি পরিধান করে দলবদ্ধভাবে সমবেত হচ্ছে ও মেলার শোভা বর্ধন করছে। সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা নানা বয়সের ও নানা ধরনের পশুকে রঙিন সাজে সজ্জিত করে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল খানায়ে কা'বার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখছিলেন। এক পর্যায়ে কুরাইশদের সম্বোধন করে বলতে থাকলেন:

'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! ভেড়া-বকরির স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। আকাশ থেকে তাদের জন্য আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাদের বেঁচে থাকার জন্য পানি ও ঘাস দিয়েছেন, যা খেয়ে ওরা জীবন ধারণ করে। তোমরা কেন ওগুলোকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে বলি দিচ্ছ? তোমরা বড়ই অজ্ঞ ও মূর্খ।'

এ কথা শোনামাত্র তাঁর চাচা, উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা খাত্তাব ভীষণ রেগে যায় এবং তাকে সজোরে চপেটাঘাত করে বলে:

'তুই নিপাত যা! এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা এর আগেও তোর মুখ থেকে বহুবার শুনেছি। প্রতিবারই আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি। এখন আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে।'

খাত্তাবের এ বকাবকি ও চপেটাঘাতের সুযোগে তারই স্বগোত্রীয় নির্বোধেরা নুফাইলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রহার করতে করতে তাকে মক্কা থেকে বের করে দেয়। তিনি হেরা পর্বতে আশ্রয় নেন। খাত্তাব কুরাইশ গোত্রের দুষ্ট ছেলেদের বলে দেয়, তোমরা প্রহরায় থাকবে, যাতে সে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে। তাই গোপনে সবার দৃষ্টি এড়ানো ছাড়া যায়েদ ইবনে আমর মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন না।

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ক্ষান্ত হওয়া বা থেমে যাওয়ার মতো পুরুষ ছিলেন না। তিনি কুরাইশদের নজর এড়িয়ে ওয়ারাকা ইবনে নাওফেল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ, উসমান ইবনে হারেস, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু উমাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকেন ও শিরকে নিমজ্জিত কুরাইশদের ব্যাপারে সমালোচনা করতে থাকেন।

যায়েদ তাদেরকে বলেন:

'আল্লাহর শপথ! তোমরা এটা ভালো করেই জান যে, তোমাদের জাতি মূর্খতা ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। তাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে দীনে ইবরাহীমের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে তোমরা দীনে ইবরাহীমের বিপরীতে চলছ। যদি তোমরা নাজাত পেতে চাও, তাহলে তোমরা নতুন কোনো ধর্মের সন্ধান কর।'

কুরাইশদের এই চার গুণীজন ইহুদী ও খ্রিস্টানসহ সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের কাছে গিয়ে ধর্ম সম্পর্কে জানার আপ্রাণ চেষ্টা চালান এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দীনে হানীফের সন্ধান করতে থাকেন।

উমাইর ইবনে সা'দ (রা)

(বাল্য জীবন)

'উমাইর ইবনে সা'দ (রা) এক বিরল ব্যক্তিত্ব।'

–উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

পিতৃহীন শিশু উমাইর ইবনে সা'দ জন্ম থেকেই সীমাহীন অভাব-অনটন ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনাতিবাহিত করতে থাকেন। তাঁর পিতা তাঁকে অভিভাবক ও কপর্দকহীন রেখে ইনতিকাল করেন। তাঁর অসহায় মা আওস গোত্রের জুলাস ইবনে সুওয়াইদ নামক ধনাঢ্য জনৈক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জুলাস ইবনে সুওয়াইদ শিশু উমাইর ইবনে সা'দকেও তার মা'র সাথে নিজ পরিবারভুক্ত করে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

জুলাস উমাইরকে এমন পিতৃস্নেহে সযত্নে লালন-পালন করতে থাকে যে, উমাইর তাঁর পিতৃবিয়োগের কথা একেবারেই ভুলে যায়। উমাইর যেমন জুলাসকে নিজ পিতার মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করত, তেমনি জুলাসও উমাইরকে নিজ সন্তানের মতোই আদর ও স্নেহ করত।

উমাইরের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার প্রতি জুলাসের স্নেহও বাড়তে থাকে। প্রতিটি কাজে, আচার-আচরণে, চলাফেরায়, শিষ্টাচারে, নীতি-নৈতিকতায়, চারিত্রিক গুণাবলিতে, সততা ও দীনদারীতে উমাইরের সমকক্ষ দ্বিতীয় আর কাউকে জুলাস দেখেনি। তাই উমাইরের প্রতি জুলাস খুবই খুশি। দশ বছর বয়স হওয়ার আগেই উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেন। নিষ্পাপ বালক উমাইরের পবিত্র অন্তরে ইসলাম তার সৌরভ ছড়াতে থাকে। শিশুকাল থেকেই উমাইর নিয়মিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে জামাআতে নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। উমাইরকে কখনো একা একা, কখনো বা স্বামীর সাথে মসজিদে নববীতে নামাযের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতে দেখে উমাইরের

মায়ের বুক আনন্দে ভরে উঠতো। সোহাগ-যত্নে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দঘন পরিবেশে উমাইর খুবই শান্তির সাথে দিনাতিপাত করছিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় বলতে কিছু ছিলো না; কিন্তু এই ঈমানদার কিশোরকে আল্লাহ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। এত অল্প বয়সে খুব কমই কেউ এরূপ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে।

নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন এবং এ যুদ্ধের জন্য আর্থিক সাহায্য ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সর্বস্তরের মুসলমানদের কাছে উদাত্ত আহবান জানালেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তখন কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন বা কোন্ দিকে অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছেন তা কখনো প্রকাশ করতেন না। বরং যেদিকে অভিযান পরিচালনা করতেন, ভাবখানা এমন দেখাতেন, যেন তার বিপরীত দিকে অভিযান পরিচালিত হবে। কিন্তু তাবুকের যুদ্ধে এর বিপরীত ঘটনা ঘটল। এবার তিনি প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে যুদ্ধ যাত্রার ঘোষণা দিলেন। এর কারণ হয়তো এই ছিলো যে, যুদ্ধক্ষেত্রের দূরত্ব ও দুর্গম পথ অতিক্রম করা ও বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় মুসলমানরা নিজেদের সার্বিক প্রস্তুতির পূর্ণ সুযোগ যেন গ্রহণ করতে পারে। সময়টিও ছিলো এমন যে, গ্রীষ্মের দাবদাহ চলছিলো, খেজুর কাটা আরম্ভ হয়েছিলো। মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে ছায়া-শীতল পরিবেশের প্রতি মানুষ যেন খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো। আরাম-আয়েশ ও অলসতা লোকালয়কে অনেকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। এ পরিস্থিতি সত্ত্বেও মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যথাসাধ্য যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অপরদিকে মুনাফিক শ্রেণী নানাভাবে মুসলমানদের সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে থাকল এবং সভা ও মাহফিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নানারূপ কুৎসা রটনা ও অযথা ইঙ্গিত করতে থাকল। এমনকি মুনাফিকরা বিশেষ বিশেষ বৈঠকে এমন সব অকথ্য ভাষায় মন্তব্য করতে শুরু করলো, যা সন্দেহাতীতভাবে কুফরীর পর্যায়ে পড়ে। যুদ্ধ প্রস্তুতির দিনগুলোর কোনো একদিন উমাইর মসজিদে নববী থেকে নামায

মায়ের বুক আনন্দে ভরে উঠতো। সোহাগ-যত্নে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দঘন পরিবেশে উমাইর খুবই শান্তির সাথে দিনাতিপাত করছিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায় বলতে কিছু ছিলো না; কিন্তু এই ঈমানদার কিশোরকে আল্লাহ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। এত অল্প বয়সে খুব কমই কেউ এরূপ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে।

নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন এবং এ যুদ্ধের জন্য আর্থিক সাহায্য ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সর্বস্তরের মুসলমানদের কাছে উদাত্ত আহবান জানালেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধাভিযানে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, তখন কার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন বা কোন্ দিকে অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছেন তা কখনো প্রকাশ করতেন না। বরং যেদিকে অভিযান পরিচালনা করতেন, ভাবখানা এমন দেখাতেন, যেন তার বিপরীত দিকে অভিযান পরিচালিত হবে। কিন্তু তাবুকের যুদ্ধে এর বিপরীত ঘটনা ঘটল। এবার তিনি প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে যুদ্ধ যাত্রার ঘোষণা দিলেন। এর কারণ হয়তো এই ছিলো যে, যুদ্ধক্ষেত্রের দূরত্ব ও দুর্গম পথ অতিক্রম করা ও বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় মুসলমানরা নিজেদের সার্বিক প্রস্তুতির পূর্ণ সুযোগ যেন গ্রহণ করতে পারে। সময়টিও ছিলো এমন যে, গ্রীষ্মের দাবদাহ চলছিলো, খেজুর কাটা আরম্ভ হয়েছিলো। মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে ছায়া-শীতল পরিবেশের প্রতি মানুষ যেন খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো। আরাম-আয়েশ ও অলসতা লোকালয়কে অনেকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। এ পরিস্থিতি সত্ত্বেও মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যথাসাধ্য যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অপরদিকে মুনাফিক শ্রেণী নানাভাবে মুসলমানদের সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করতে থাকল এবং সভা ও মাহফিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে নানারূপ কুৎসা রটনা ও অযথা ইঙ্গিত করতে থাকল। এমনকি মুনাফিকরা বিশেষ বিশেষ বৈঠকে এমন সব অকথ্য ভাষায় মন্তব্য করতে শুরু করলো, যা সন্দেহাতীতভাবে কুফরীর পর্যায়ে পড়ে। যুদ্ধ প্রস্তুতির দিনগুলোর কোনো একদিন উমাইর মসজিদে নববী থেকে নামায

প্রিয় পাঠক!

প্রখ্যাত সাহাবী উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাল্যকালের চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এখন আমরা তাঁর কর্মবহুল জীবনের আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মজীবনের এ ঘটনা তাঁর বাল্য-জীবনের বর্ণিত ঘটনার চেয়ে কোনো অংশে কম আকর্ষণীয় নয়।

মধ্য সিরিয়ায় দামেশক ও হালাব-এর মধ্যবর্তী স্থানে 'হিম্‌স' নগরী অবস্থিত। যেখানে রয়েছে প্রখ্যাত সাহাবী খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবর। হিম্‌সবাসী সর্বদাই তাদের গভর্নরের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজত এবং তিলকে তাল করে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট অভিযোগ করত। কোনো গভর্নরই তাদের তীব্র সমালোচনা থেকে মুক্ত ছিলেন না। যাকেই গভর্নর নিযুক্ত করা হতো, তারই বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি বের করে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে অভিযোগ দায়ের করত এবং তদস্থলে ভালো অন্য কোনো ব্যক্তিকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগের আবেদন জানাত। এই প্রেক্ষাপটে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে গভর্নর নিযুক্ত করার চিন্তা করলেন, যিনি হবেন সব অভিযোগের ঊর্ধ্বে ও তাঁর চরিত্র হবে ত্রুটিমুক্ত। এ লক্ষ্যে তিনি একজন সুদক্ষ তীরন্দাযের ন্যায় তূণ থেকে একটা একটা করে তীর বের করে একটা পছন্দসই তীর বাছাই করার ন্যায় এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজতে থাকলেন, যিনি হিম্‌স-এর গভর্নর হিসেবে উপযুক্ত হতে পারেন।

পরিশেষে তিনি উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেয়ে খোদাভীরু ও যোগ্য ব্যক্তি আর কাউকে পেলেন না। অথচ উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ সময় বিজয়ী মুজাহিদদের এক বিশাল বাহিনীর সেনানায়ক হিসেবে সিরিয়ায় যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি সিরিয়ায় একের পর এক দুর্গ জয় করে একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত করছিলেন, অপরদিকে ঘটাচ্ছিলেন তাওহীদের ব্যাপ্তি। সে অঞ্চলের গোত্রগুলো তাঁর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে ইসলামে দীক্ষা নিতে শুরু করে। বিজিত অঞ্চলের প্রতিটি

জনপদে তিনি ইসলামী শিক্ষা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মসজিদ নির্মাণ করতে থাকেন! ইসলামী জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে সকল নাগরিকের ঈমানী মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে মযবুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার পরও আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান। তিনি মদীনায় পৌঁছলে তাঁকে হিম্‌স প্রদেশের গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করেন এবং সেখানে গিয়ে দায়িত্বভার বুঝে নিতে নির্দেশ দেন। একজন সৈনিক হিসেবে আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে তাঁর কাছে গভর্নরের পদটি অধিক গৌরবের ছিলো না। তাই তিনি তা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করলেও পরিশেষে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সে পদ গ্রহণ করতে সম্মত হলেন।

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবনিযুক্ত গভর্নর হিসেবে হিম্‌সে পৌঁছে জনসাধারণকে হিম্‌সের জামে মসজিদে সমবেত হতে আহ্বান জানালেন। নামাযশেষে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে সর্বাগ্রে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করে বললেন,

'প্রিয় ভাইয়েরা, ইসলাম নিঃসন্দেহে একটি সুরক্ষিত দুর্গ, তেমনি এর দরজাও দুর্ভেদ্য। আর ইসলামের দুর্গ হলো ন্যায়বিচার এবং এর দরজা হলো ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা। ন্যায়বিচারে পক্ষপাতিত্ব, সত্যের পরিপন্থী কার্যকলাপ, ইসলামের দুর্গকে ভেঙে চুরমার করে দেয়, যা ইসলামকে ধ্বংস করার শামিল। ইসলাম ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয়ী ও শক্তির উৎস হিসেবে বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক তার শাসন ক্ষমতায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। শাসকের বলিষ্ঠ ভূমিকার অর্থ ক্ষমতাবলে জনগণকে দমিয়ে রাখা বা তলোয়ারের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে নিপাত করা নয়; বরং ন্যায়বিচার ও সত্যবাদিতায় অটল থাকা।'

এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর তিনি জনগণের সামনে তাঁর কর্মসূচি তুলে ধরলেন। উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীর্ঘ এক বছর অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে হিম্‌সের শাসনভার পরিচালনা করেন। হিম্‌সবাসী আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে কোনো অভিযোগ করেননি। আর না এ সময়ে উমাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর

কাছে কোনো পত্র দেন কিংবা কেন্দ্রীয় বায়তুল মালে খিরাজের এক কপর্দক প্রেরণ করেন।

এ দীর্ঘ নীরবতা উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। কেননা, তিনি তাঁর গভর্নরদের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, যেন ক্ষমতা তাদের কোনো রকম অন্যায় কাজে জড়িত না করে ফেলে। কারণ, উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কোনো ব্যক্তিই মাসূম বা নিষ্পাপ হিসেবে গণ্য ছিলেন না।

অতঃপর তিনি তাঁর সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন যে, উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই বলে নির্দেশ প্রেরণ করুন যে,

'এ পত্র পাওয়ামাত্র হিম্‌স ছেড়ে আমীরুল মুমিনীন-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় চলে আসুন এবং আসার প্রাক্কালে মুসলমানদের খিরাজের যে অর্থ সংগ্রহ করেছেন তাও সঙ্গে নিয়ে আসুন।'

উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে পত্র পাওয়ামাত্রই হিম্‌সবাসীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

অতঃপর তাঁর খাদ্যদ্রব্য বহনের একমাত্র থলেটিতে ওযূ করার বদনাটি ঢোকালেন, যুদ্ধাস্ত্র ও বর্মটি হাতে নিলেন এবং হিম্‌স নগর-এর গভর্নরের পদটি পেছনে রেখে পদব্রজে মরুপথে মদীনার দিকে রওনা হলেন। মদীনায় পৌঁছতে উমাইর ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। পানাহারের অভাবে স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে পড়লো, দাড়ি, গোঁফ ও মাথার চুল লম্বা হয়ে গেলো এবং সফরের ক্লান্তি তাঁকে ভীষণভাবে দুর্বল করে ফেলল। ভগ্ন স্বাস্থ্য, ক্লান্ত দেহে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবারে হাজির হলেন। তাঁর অবস্থা দেখে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং বলে উঠলেন:

মু'আয ইবনে জাবাল (রা)

'আমার উম্মতের মধ্যে হালাল ও হারাম এবং শরীআতের জ্ঞান সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো মু'আয ইবনে জাবাল।'

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)

সত্য ও হেদায়াতের আলোতে জাযিরাতুল আরব যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তখন মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়াসরিব শহরের একজন কিশোর মাত্র।

সমবয়স্ক অন্যদের তুলনায় তিনি ছিলেন অধিকতর মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। বক্তা হিসেবে এবং তার্কিক হিসেবেও ছিলেন তিনি অসাধারণ কৃতিত্বসম্পন্ন। মাথায় ছিলো কোঁকড়ানো চুল ও মুক্তার মতো ঝকঝকে তাঁর দাঁত। কালো চক্ষুবিশিষ্ট ও সুঠামদেহী এই কিশোর সবার দৃষ্টি কেড়ে নিত। নবযৌবনেই তিনি দৈহিক গঠন এবং চারিত্রিক গুণাবলিতে ইয়াসরিবের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে পরিচয় লাভ করেন।

কিশোর মু'আয ইবনে জাবাল মক্কা থেকে আগত ইসলামের প্রথম দাঈ মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। 'লাইলাতুল আকাবা' বা আঁধার রাতে আকাবার বায়'আত অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর নিষ্পাপ হাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসাফাহা করেন ও বায়'আত গ্রহণ করেন।

আকাবায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণকারী ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বাহাত্তর জন সাহাবীর তিনিও একজন। যারা সেই রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নাম ইসলামের ইতিহাসে কিয়ামত অবধি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বায়'আত আল আকাবা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে মু'আয ইবনে জাবাল তাঁর সমবয়সী কিশোরদের সুসংগঠিত করে মদীনার ভূমি থেকে মূর্তি উচ্ছেদ কমিটি নামক একটি কিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। দিবালোকেই হোক বা রাতের অন্ধকারেই হোক ইয়াসরিবের ভূমিকে মূর্তির অভিশাপ থেকে মুক্ত করাই ছিলো তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই কিশোর সংগঠনের আন্দোলনের ফলেই আমর ইবনুল জামূহ'র মতো ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন। বনূ সালামা গোত্রপতি আমর ইবনুল জামূহ ইয়াসরিবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম এক মহৎ ব্যক্তি। আরবের প্রথানুযায়ী অন্যান্য গোত্রপতি ও নেতাদের ন্যায় সে নিজেও মূল্যবান চন্দন কাঠ দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করে উপাসনালয়ে সংরক্ষণ করে।

বনূ সালামা গোত্রের এই নেতা তার মূর্তিকে অত্যন্ত ভক্তির সাথে সযত্নে রেশমি কাপড়ের চাদরে মুড়িয়ে রাখত এবং প্রতিদিন তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে রওগন দ্বারা পরিচর্যাও করত।

মু'আয ইবনে জাবালের এ শিশু-কিশোর সংগঠনের কতিপয় সদস্য রাতের অন্ধকারে আমর ইবনুল জামূহ'র সেই মূর্তিটিকে তুলে নিয়ে তারই বাড়ির পিছনে বনূ সালামা গোত্রের আবর্জনার গর্তে রেখে আসে।

প্রতিদিনের ন্যায় প্রত্যুষে পূজা-অর্চনার জন্য আমর ইবনুল জামূহ মূর্তিঘরে গিয়ে যথাস্থানে মূর্তিকে না পেয়ে ভীষণ হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দেয়। চারিদিকে ছোটাছুটি করে মূর্তি খুঁজতে থাকে। অবশেষে মূর্তিটিকে সেই আবর্জনার স্তূপে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে সেটি উদ্ধার করে।

মূর্তিকে এ দুরবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে দুঃখ ও ভারাক্রান্ত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল :

'রাতের আঁধারে দেবতার সাথে যে এমন আচরণ করেছে, তাকে ধিক্কার দিচ্ছি।'

অতঃপর সে মূর্তিকে ময়লার গর্ত থেকে তুলে এনে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে সুগন্ধি লাগিয়ে একই স্থানে রেখে দেয়। এবার মূর্তির প্রতি তাকিয়ে করজোড়ে নিবেদন করে :

'হে মানাত দেবতা! আল্লাহর শপথ করে বলছি, সত্যিই যদি আমি জানতে পারতাম, তোমার সাথে কে এই আচরণ করেছে, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে লাঞ্ছিত করতাম।'

রাত ঘনিয়ে এলে গোত্রপতি আমর ইবনুল জামূহ নিয়মমতো ঘুমিয়ে পড়ে। এ রাতেও একই ঘটনা ঘটল। এবারও তাকে অন্য এক গর্তে নিক্ষেপ করা হলো। সকালে সে মূর্তিকে যথাস্থানে অনুসন্ধান করতে থাকে, কিন্তু সেখানে মূর্তিটিকে না পেয়ে দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেলো, বাড়ির পিছনে মূর্তিটি অন্য একটি ময়লার গর্তে পড়ে আছে।

গর্ত থেকে পুনরায় মূর্তিটিকে কুড়িয়ে এনে আগের নিয়মে ধোয়া-মোছা করে আতর-খোশবু লাগিয়ে সুবাসিত করে একই স্থানে রেখে দিল। এবার সে অপরাধীকে খুঁজে বের করে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করলো।

পরের রাতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সকালে এই মূর্তিটিকে একই স্থানে দেখে সে অবাক হয়ে গেলো। শেষবারের মতো তাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে সুবাসে সুবাসিত করে তার গলায় নিজের তরবারিখানা ঝুলিয়ে দিয়ে নিবেদন করলো :

'হে দেবতা! তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, কে বা কারা তোমার সাথে এই অসৎ আচরণ করছে। তোমার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত থাকে, তবে আজ রাতে তুমিই তোমাকে রক্ষা করবে, সেই উদ্দেশ্যেই এ তলোয়ার তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিলাম।'

অন্যান্য রাতের ন্যায় এ রাতেও গোত্রপতি আমর ইবনুল জামূহ ঘুমিয়ে পড়লে সেই সংগঠনের সদস্যরা লুকিয়ে লুকিয়ে মূর্তিঘরে উপস্থিত হলো। তারা মূর্তির গলার ঝুলন্ত তলোয়ারখানা নিয়ে তদস্থলে একটি মৃত কুকুর বেঁধে দিলো এবং এ দুটিকে একত্রে বেঁধে সেসব গর্তের একটিতে ফেলে এল। প্রত্যুষে গোত্রপতি শয্যা ত্যাগ করেই মূর্তির সন্ধান নিতে এলে দেখতে পেল, মূর্তিটি আজও যথাস্থানে নেই, এমনকি পূর্বের গর্তগুলোতেও নেই। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করে পরিশেষে দেখতে পায়, মূর্তিটি মৃত কুকুরের সাথে একই রশিতে বাঁধা উল্টোমুখী হয়ে ময়লা-আবর্জনার এক গহীন গর্তে পড়ে আছে।